পুতিনের ভাষণ : মুখোমুখি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র

ফারুক চৌধুরী

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাম্প্রতিক একটি ভাষণ বেশ আলোড়ন তুলেছে। পুতিন এই ভাষণে যেসব বিষয় উত্থাপন করেন তা বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

ভ্লাদিমির পুতিন গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সে দেশের ফেডারেশন অ্যাসেম্বলিতে প্রেসিডেন্টের বার্ষিক ভাষণে তাঁর দেশের তৈরি করা কয়েকটি অস্ত্রের উল্লেখ করেন। আর ভাষণের দ্বিতীয় অংশে ছিল কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য।[১] মূলধারার তথ্যমাধ্যম মূলত উল্লেখিত অস্ত্রগুলোর প্রসঙ্গ নিয়ে হৈচৈ শুরু করে। এই হৈচৈ করার কারণ রয়েছে।

পুতিনের ভাষণে উল্লেখিত অস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে : (১) নতুন ধরনের আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, (২) খুবই ছোট আকারের পারমাণবিক রি-অ্যাক্টরচালিত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, যার পাল্লা প্রায় অসীম বলে দাবি করা হয়, (৩) ডুবোজাহাজের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি গতিতে মহাদেশের পর মহাদেশ পাশ কাটিয়ে বিমানবাহী জাহাজে আঘাত করতে পারে এমন ডুবো ড্রোন, (৪) শব্দের চেয়ে বহুগুণ বেশি বেগে ছুটতে পারে এমন অস্ত্র। ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি চালানোর জন্য যে পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি পারমাণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজে ব্যবহৃত রি-অ্যাক্টরের চেয়ে ১০০ গুণ ছোট। এছাড়া আরো কয়েকটি অস্ত্রের কথাও উল্লেখিত হয় পুতিনের ভাষণে। পুতিনের দাবি, এসব অস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষমতা বিরাজমান কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নেই। একথার মধ্য দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন। পুতিন তাঁর ভাষণে সে কথাই বলেছেন, রাশিয়ার এসব নতুন অস্ত্র রাশিয়ার দিকে তাক করে রাখা যুক্তরাষ্ট্রের সব অস্ত্রকে করে ফেলেছে সেকেলে।

পুতিনের বক্তৃতার অস্ত্র সংক্রান্ত অংশটিকে মূলধারার তথ্যমাধ্যম বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর বক্তৃতার যে অংশে রাজনৈতিক বক্তব্য রয়েছে, সেটি কার্যত গুরুত্ব পায়নি। অথচ এই রাজনৈতিক বক্তব্যটিই গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নানা ইঙ্গিত।

রাশিয়ার অস্ত্রের খবর রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর কাছে আগে থেকেই ছিল, এটা ধরে নেয়া যায়। পুতিনের ভাষণের মাধ্যমে দেয়া অস্ত্রের খবরটি রুশদেশের ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের জন্য। সেই সাথে রয়েছে অনুষ্ঠেয় রুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনি মাঠের দিকে খেয়াল রেখে অস্ত্রের খবরটি বাজারে ছাড়া হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। তাই খেয়াল করতে হবে পুতিনের রাজনৈতিক কথা। কারণ রাশিয়ার আজকের অবস্থা ও অবস্থান হঠাৎ হয়নি বা মাথাচাড়া দেয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া একটি নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়।

সেই বাস্তবতা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে রাশিয়ার প্রতি অবজ্ঞার, অপমানের; রাশিয়ার স্বার্থের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার। পুতিন সেদিকে ইঙ্গিত করেই যুক্তরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে একতরফা আগ্রাসী কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা ক্ষেত্রে রাশিয়ার মত-অবস্থান বিবেচনা করতে হবে। রুশ প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, রাশিয়ার নিরাপত্তা খাটো করে দেখার চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রকে থামাতে হবে, রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রকে সমান শরিক হিসেবে আলোচনা শুরু করতে হবে; যুক্তরাষ্ট্র আর যেন প্রাধান্য বিস্তার করা সামরিক শক্তি হওয়ার চেষ্টা না করে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে রাশিয়া অল্পকালের মধ্যে ধাক্কাটি সামলে উঠতে পারবে না, তাই রাশিয়াকে সহজেই অবজ্ঞা করা যাবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা যদি রাশিয়ার যুক্তিসংগত উদ্বেগগুলোতে অবজ্ঞা না করত তাহলে এসব নতুন অস্ত্রের দরকার হত না। পুতিন বলেন, মূল সমস্যা নিয়ে কেউ আমাদের সাথে কথা বলতে চায়নি; কেউ আমাদের কথা শোনেনি। এখন আপনারা আমাদের কথা শুনুন। গত ১৫ বছর ধরে যাঁরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছেন, রাশিয়ার কাছ থেকে একতরফা সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করছেন; রাশিয়ার ক্ষেত্রে আরোপ করছেন নানা বিধি-নিষেধ, যে বিধি-নিষেধগুলো আন্তর্জাতিক আইনের চোখে বেআইনি, যেগুলোর লক্ষ্য সামরিক ক্ষেত্রসহ নানা ক্ষেত্রে আমাদের দেশের উন্নতিতে বাধা দেয়া। কিন্তু এ সবই ব্যর্থ হয়েছে, একথাই বলতে চাই।

কোন কোন মহল থেকে বলা হচ্ছে যে পুতিনের এই ভাষণের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ (এটিকে কোল্ড ওয়ার বা ঠান্ডা যুদ্ধ বা শীতল যুদ্ধ হিসেবেও কেউ কেউ অভিহিত করেন) আবার শুরু হলো।

পুতিনের ভাষণের এ অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। জায়গা ছাড়তে হবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের। সে জায়গা বিশ্ববাজার। সে জায়গা ভূ-রাজনীতির দিক থেকে, ভূ-রণনীতির দিক থেকে, ভূ-রণকৌশলের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো, ক্ষেত্রগুলো।

রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা জায়গা ছেড়ে দেবে সহজে–এমন ভেবে নেয়ার কারণ নেই। তবে রাশিয়া জায়গা করে নিচ্ছে। ইতোমধ্যেই তেমন নানা ঘটনা ঘটছে। সিরিয়ায় তেমন ঘটেছে, সেকথা সবারই জানা।[২] ক্রিমিয়ার ঘটনাও সবার জানা।[৩] এ ধরনের আরো ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটে চলছে।[৪] সেসবও সবার জানা।

এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে বিশ্ব পরিস্থিতি। আজ আর একথা বলার অবকাশ নেই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে পৃথিবীকে এক মেরুর বিশ্ব বলে অনেকের কাছে যা মনে হয়েছিল, সেটাই সত্যি। সেদিনও পৃথিবী এক মেরুবিশিষ্ট ছিল না, আজও নেই। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা, ইচ্ছামত, মসৃণভাবে ঝটকা-অভিযান চালানোর দিন আর নেই। লিবিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের একতরফা স্থান দেয়ার ঘটনার পুনারাবৃত্তি আজ দুষ্কর, যদি দেশটির প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের বিক্রি না করে।

এ কারণেই পুতিনের বক্তৃতাটি গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন মহল থেকে বলা হচ্ছে যে পুতিনের এই ভাষণের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ (এটিকে কোল্ড ওয়ার বা ঠান্ডা যুদ্ধ বা শীতল যুদ্ধ হিসেবেও কেউ কেউ অভিহিত

করেন) আবার শুরু হলো।[৫] এ বক্তব্য বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সেই বিতর্কে না গিয়ে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পুতিনের এ ভাষণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষিত হল যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশিত তার একক কর্তৃত্ব একতরফাভাবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টার। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বা সব জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চাইলেই তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা একতরফাভাবে চাপিয়ে দিতে পারবে না। তারা সে চেষ্টা করলে কোথাও কোথাও বাধার সম্মুখীন হবে, কোথাও কোথাও পারবে না, যেমন পেরেছিল আফগানিস্তানে, ইরাকে, লিবিয়ায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ওমর খৈয়ামের কথায়, 'দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক'; অর্থাৎ কোথায় কোন সে দূরে রুশদেশ, সে দেশের প্রেসিডেন্ট কী বললেন আর কী বললেন না, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের কী লাভ?

এক দিক থেকে বিচার করলে প্রশ্নটি কারো কারো কাছে যৌক্তিক মনে হতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা জনগণের গণতান্ত্রিক জীবনধারা গড়ে তোলার সংগ্রাম সংশ্লিষ্টদের কাছে উপরোক্ত প্রশ্ন নেহাতই অজ্ঞতার সমার্থক। কারণ আজ শক্তিধর দেশগুলোর, প্রতাপান্বিত পুঁজির নানা কাজ নানা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও প্রভাব ফেলে। এসবের অনেক নজির পাওয়া যায়। তাই এ বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা দরকার। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঠিক পথে পরিচালনা করা সহজ হয়।

শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যকার প্রতিযোগিতার বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারার জন্য দৃষ্টি দেয়া উচিত যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপ, নীতি, ঘোষণা, পরিকল্পনা, কর্মসূচির দিকে। এটা খেয়াল না রাখলে বিভ্রান্তি তো সৃষ্টি হবেই; সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদে পা দেয়া বা সেই ফাঁদে আটকে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। খোদ বাংলাদেশেই এ উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণ রয়েছে খোদ ঢাকাতেই, প্রকাশ্য রাজপথে সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনার পক্ষে স্লোগান তোলার।[৬]

তাই শক্তিধর দেশগুলোর প্রতিযোগিতার দিকে খেয়াল রাখার অংশ হিসেবেই দৃষ্টি দেয়া যাক যুক্তরাষ্ট্রের দিকে।

পুতিনের ঘোষণার কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রকাশ করে দুটি দলিল। এই দলিল দুটি হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি বা জাতীয় নিরাপত্তা নীতি এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি বা জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি।[৭] এ দুটি দলিলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রণপ্রস্তুতির কথা। প্রথম দলিলটি প্রকাশিত হয় গত ডিসেম্বর মাসে এবং শেষোক্ত দলিলটি প্রকাশিত হয় গত জানুয়ারিতে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি শীর্ষক দলিলটিতে বলা হয়, দূর-পরিসরে রণনীতিগত প্রতিযোগিতা আবার দেখা দিয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রতি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এই দলিলে বলা হয়, ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে চীন ও রাশিয়া তাদের কর্তৃত্ববাদী মডেলের সাথে সংগতি রেখে পৃথিবীকে রূপ দিতে চায়; তারা অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলোতে তাদের একক কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে চায়।

জাতীয় নিরাপত্তা নীতি শীর্ষক দলিলে বলা হয়, চীন ও রাশিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার ফলে যুক্তরাষ্ট্র গত দুই দশকের নীতিগুলো নিয়ে আবার ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করছে। গত দুই দশকে অনুসৃত নীতির মূল ভিত্তি হিসেবে যে যুক্তিটি ছিল, তা ভুল বলে দেখা দিয়েছে। এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবল শক্তিতে এগিয়ে চলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তাই এসব প্রতিযোগিতার দিকে খেয়াল রাখা দরকার। এসব প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত রাষ্ট্রগুলো, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক উইলিয়াম আর থমসনের ভাষায়, 'একই ভূখণ্ড দখলের ইচ্ছা পোষণ করে, একই বাজার দখলের চেষ্টা করে, অথবা একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।'[৮]

বাংলাদেশের এবং অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে বিষয়টি বুঝতে সমস্যা হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় কয়েকটি বিষয়। এগুলো হলো :

(১) সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্বের যে বিশ্বধারা শুরু হয়েছিল, তার অবসান ঘটেছে আনুষ্ঠানিকভাবে। এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেরকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে; তারা নিজেদের ইচ্ছামত কাজকারবার চালাতে পারবে না।

(২) যুক্তরাষ্ট্র আরো আগ্রাসী, আরো আক্রমণমুখী হয়ে উঠবে; এবং এজন্য রণপ্রস্তুতি আরো বাড়াবে।

(৩) এর প্রভাব পড়বে নানা দেশে এবং নানা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে; এবং বাংলাদেশ এ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবে না।

ফারুক চৌধুরী: লেখক, অনুবাদক।
ইমেইল: farooque_chowdhury@yahoo.com

টীকা:

১) ফারুক চৌধুরী, 'দি ইমপেরিয়ালিস্ট পাওয়ার্স হ্যাভ টু লিসেন টু রাশিয়া', www.countercurrents.org, ২ মার্চ ২০১৮

২) ফারুক চৌধুরী, 'এম্পায়ার্স অ্যাগ্রেসন অন সিরিয়া', ৭ এপ্রিল ২০১৭; 'সিরিয়া এক্সপিডিশন', ৮ এপ্রিল ২০১৬; 'সিরিয়া ব্যাটল লাইন্স ক্রিয়েট টাফ কোয়েশ্চেন্স ইন জিওপলিটিক্স : লেসনস নট টু বি মিসড', ৩ অক্টোবর ২০১৫; 'এম্পায়ার এক্সপোজড ওয়ানস এগেইন : দ্য সিরিয়া ইন্টারভেনশন কেস', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫; এবং এ বিষয়ে কয়েকটি লেখা; www.countercurrents.org

৩) ফারুক চৌধুরী, 'ইউক্রেন ইজ নট রাশিয়ান রুলেট', ৩ মার্চ ২০১৪, www.countercurrents.org

৪) ফারুক চৌধুরী, 'এ ডিফারেন্ট আফ্রিকান ইউনিয়ন', ৪ জুলাই ২০১১, www.countercurrents.org

৫) মাইকেল টি ক্লেয়ার, 'দ্য নিউ কোল্ড ওয়ার ইজ হেয়ার–অ্যান্ড নাউ থ্রি মেজর পাওয়ার্স আর ইনভলবড', ৮ মার্চ ২০১৮; দ্য নেশন; এবং লরেন্স ফ্রিডম্যান, 'পুতিনস নিউ কোল্ড ওয়ার', ১৪ মার্চ ২০১৮, নিউ স্টেটসম্যান

৬) এই বিপজ্জনক প্রবণতার খবর ও ছবি ঢাকার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে স্থান পায়

৭) ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা, ডিসেম্বর ২০১৭; সামারি অব দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা, শার্পেনিং দি আমেরিকান মিলিটারিজ কম্পিটিটিভ এজ, ২০১৮

৮) উইলিয়াম আর থমসন (সম্পা.), গ্রেট পাওয়ার রাইভালরিজ, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলাইনা প্রেস, সাউথ ক্যারোলাইনা, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৯৯